‘নাস্তিক ব্লগার’ হত্যাকাণ্ড, ‘হোমো সাকের’ ও জনতার সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

পারভেজ আলম

পরিস্থিতি এমন যে, বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ বা র‍্যাব যদি কাউকে ‘সন্ত্রাসী’ বলে মনে করে তাহলে ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘এনকাউন্টার’ নামে তাকে হত্যা করা বৈধ; কোনো এলাকার কিছু মানুষ যদি কাউকে চোর বা ডাকাত মনে করে তবে তাকে পিটিয়ে খুন সমাজে স্বীকৃত; কাউকে যদি ‘নাস্তিক ব্লগার’ বলে ডাকা যায় তাহলে ছুরি চাপাতিতে তার খুন হওয়াও সমাজে সমর্থিত। আইন আদালত আর বিচার ব্যবস্থার বাগাড়ম্বরের মধ্যে এ কোন সমাজ রাষ্ট্রে আমরা বসবাস করছি? এই প্রবন্ধে তার অনুসন্ধানে তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা হাজির করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ‘নাস্তিক ব্লগার’ অভিধাপ্রাপ্ত মানুষের জীবনের দাম নাই বলতে গেলে চলে। গত কিছুদিনে প্রায় প্রতি মাসেই তাঁদের একজন করে নিহত হয়েছেন। খুনিরা গ্রেফতার হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে অনেকেই ‘জজ মিয়া’ বলে সন্দেহ করেন। সবমিলিয়ে এইসব হত্যাকাণ্ডের বিচারের আশা হয়ে উঠেছে সুদূরপরাহত। এইসব হত্যাকাণ্ডের বিচারহীনতার কারণে এসব হত্যাকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব মিলিয়ে ‘নাস্তিক ব্লগার’ হয়ে উঠেছে প্রাচীন রোমান আইনে ঘোষিত ‘হোমো সাকের’ (homo sacer) এর আরেক নাম, যাকে যে কেউ হত্যা করতে পারে এবং যে হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয় না। ‘হোমো সাকের’ ধারণাটিকে সমসাময়িক চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন ইতালিয় দার্শনিক জর্জিও আগামবেন। হোমো সাকের একজন আউট ল, সে আইনের উর্ধ্বে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ডাইনি অথবা উলফম্যান বহু নামে তাকে ডাকা হয়েছে। এই ধারণার ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন আগামবেন তাঁর লেখা ‘হোমো সাকের, সোভেরিন পাওয়ার এন্ড বেয়ার লাইফ’ এবং ‘স্টেট অফ এক্সেপশন’ নামক গ্রন্থে।

সব মিলিয়ে ‘নাস্তিক ব্লগার’ হয়ে উঠেছে প্রাচীন রোমান আইনে ঘোষিত ‘হোমো সাকের’ (homo sacer) এর আরেক নাম, যাকে যে কেউ হত্যা করতে পারে এবং যে হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয় না।

ব্লগারদের এই ‘হোমো সাকের’ হয়ে ওঠার শুরু কোথায়? আপাতত বলা যায়, এর শুরু শাহবাগে। কাদের মোল্লার ফাঁসির স্লোগান তুলে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার মধ্যেই নাস্তিকদের আজকের দূর্দশার সূত্রপাত। কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়ে গেছে। কিন্তু তার পাল্টা রাজনৈতিক কৌশলের শিকার হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছিলো শাহবাগ আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী কতিপয় নাস্তিক ব্লগারকে। রাজীব হায়দারকে হত্যা করা হয়েছিল ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, শাহবাগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে। তখন শাহবাগে মোমবাতি জ্বালানো হলে শেখ হাসিনাও জ্বালান। তিনি তখন শাহবাগে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। রাজীব হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ছুটে গেলেন রাজীবের বাসায়। কিন্তু মিডিয়াগুলিতে রাজীবের লেখা যখন একের পর প্রকাশিত হলো, এবং যখন হেফাজতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো তখন পরিস্থিতি গেলো পাল্টে। রাজীবের লেখা ছড়িয়ে দেয়া হলো বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। সেসময় কয়েকজন নাস্তিক ব্লগারের লেখার বিভিন্ন অংশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছাপিয়ে নাস্তিকদের ডেমোনাইজেশন এবং ডি-হিউমেনাইজেশনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল বেশকিছু দৈনিক পত্রিকা। ‘রাজাকারের ফাঁসি চাই’ স্লোগানের বিপরীতে হাজির করা হয়েছিলো ‘নাস্তিকের ফাঁসি চাই’ স্লোগান। ঐ সময় আল্লামা আহমদ শফি নাস্তিকবিরোধী ফতোয়া দিচ্ছেন, খালেদা জিয়া নাস্তিকতার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, ফরহাদ মজহার নাস্তিক শব্দের অর্থ বিস্তৃত করে নাস্তিকবিরোধী বক্তৃতা দিচ্ছেন। ব্লগার, নাস্তিক ও শাহবাগী এইসব শব্দ তখন একে অপরের প্রতিশব্দে পরিণত হয়ে গেলো। পরিস্থিতি এমন হয়ে গেলো যে কেউ নাস্তিকদের পক্ষে কিছু বললে অথবা নাস্তিক হত্যার বিচার চাইলে অথবা নাস্তিকদের ফাঁসির দাবির আন্দোলনে বাধা দিলেও তাকে নাস্তিক ট্যাগ দিয়ে দেয়া হবে।

রাজীব হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দী দিয়েছে কিছু ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী। তাও সারাদেশে মোটামুটি যা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা হলো যে রাজীব হত্যাকাণ্ডের জন্যে আসলে রাজীবই দায়ী। আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে ঐসব বাজে কথা লিখেছে বলেই তাকে মরতে হয়েছে। অর্থাৎ নাস্তিক শাহবাগী হত্যাকাণ্ডের দায় নাস্তিক শাহবাগীদের ঘাড়েই চাপানো গেছে। নাস্তিকদের ফাঁসি দাবি করে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলে এও বুঝিয়ে দেয়া হলো যে ভবিষ্যতে নাস্তিক হত্যার দায় নাস্তিকদের ঘাড়েই চাপানো হবে। খুনিরাও একরকম নৈতিক বৈধতা পেয়ে গেলো। অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে, খুনের আসামিকে জামিন দেয়া হলেও তা নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা দেখা গেলো না। রাজীব হত্যার দায় অত্যন্ত সফলভাবে রাজীবের ঘাড়েই চাপানো গেছে। ফলে অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয়, নিলয় নীল, ওয়াশিকুর বাবুরাও খুন হলেন। এবং প্রতিটা খুনের পরেই তাদের লেখালেখিকেই এই খুনের জন্যে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম, ওলামা লীগ থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন।

বাংলাদেশের ‘নাস্তিক ব্লগার’দের জীবন শাহবাগ আন্দোলনের সময় থেকেই হয়ে গেছে নিছক জীবের জীবন (bare life), তখন থেকেই তারা হয়ে উঠেছে বাংলার নতুন হোমো সাকের। যাদের বিচার ছাড়াই হত্যা করা যায় এবং যাদের হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয় না। ব্লাসফেমি বা এপোস্টেসির দায়ে মৃত্যুদণ্ডের দাবির উৎস ধর্মীয় আইন। যারা ব্লগারদের হত্যার দায় স্বীকার করছে তারা দাবি করছে যে ইসলামী আইন অনুসারে তারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। হেফাজতে ইসলাম কিংবা ওলামা লীগ, যারা ব্লগারদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন করেছে তাদের দাবি তারা এই ধরনের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সমর্থন করেন না। অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ড ধর্মীয় অথরিটিদের আইনগত বৈধতা পাচ্ছে না। আল্লামা শফি জানাচ্ছেন,

নাস্তিকদের হত্যা করা 'ওয়াজিব' হয়ে গেছে (ফরজ নয়), কিন্তু প্রত্যেক ব্লগারের হত্যাকাণ্ডের পর হেফাজতে ইসলাম (ইসলামের রক্ষক) বিবৃতি দিচ্ছে, তারা এ ধরনের হত্যা সমর্থন করে না। তারা চান বিচার করেই নাস্তিকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক। কিন্তু তারা ধর্মীয় আইনে নয়, সেকুলার আইনে এই বিচার চান। অপরাধের মাত্রা তারা ধর্মীয় অবস্থান থেকে বিচার করলেও অপরাধীকে ইসলামী আইনের আওতার বাইরে রেখেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকারও ব্লগারদেরকে সেকুলার আইনে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান না, কারাদণ্ড দিতে চান মাত্র। একদিকে ব্লগারদেরকে ধর্মীয় আইনে বিচার করে হত্যা করতে ইসলামিস্টরা অনাগ্রহী আরেকদিকে সেকুলার আইনে বিচার করে হত্যা করতে সরকার অনাগ্রহী। কিন্তু ব্লগারদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে দুই পক্ষই বিচারহীনতার সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে ও নৈতিক সমর্থন যোগাতে আগ্রহী। হোমো সাকেরের একটি বৈশিষ্ট হলো তাকে হত্যা করলে কোন বিচার হবে না, অর্থাৎ তাকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো তাকে রিচুয়াল সেক্রিফাইস (ধর্মীয় আইনে) অথবা বিচারিক হত্যা (সেকুলার আইনে) করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে যে আইনগতভাবে না হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এবং ঘটনাচক্রে 'নাস্তিক ব্লগার'রা হোমো সাকেরের এই দুই বৈশিষ্টই লাভ করেছে।

কিন্তু বাংলাদেশে কি শুধু নাস্তিকরাই হোমো সাকেরের একমাত্র রূপ হিসাবে হাজির? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের শিক্ষক বখতিয়ার আহমেদ সম্প্রতি "গুম-খুন-আতঙ্ক: শাসনপ্রণালী ও হত্যার কথকতা" নামক একটি লেখায় র‍্যাবের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি কেন্দ্র করে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলাপ তুলেছেন (আহমেদ, ২০১৫)। র‍্যাব অথবা পুলিশের হাতে তথাকথিত ক্রসফায়ারে নিহত একজন সন্ত্রাসী 'হোমো সাকের' ছাড়া আর কি? তাকে তো বিচার ছাড়াই হত্যা করা যায়। এইক্ষেত্রে নিহত এবং খুনি দুইজনই জনগণের চোখে আইনের উর্ধ্বে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে সরকারবিরোধী বিভিন্ন দলের নেতা কর্মী যারা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, গুম খুনের শিকার হয়েছেন তাদেরকেও কি একই পাল্লায় মাপা যায় না? আওয়ামী লীগ সরকার এবং তাদের সমর্থক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এদেরকে গড়পরতা 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে এই ধরণের হত্যাকাণ্ডে নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছেন। অথচ হয়তো তাদের একটা বড় অংশকেই তাদের অপরাধ বিবেচনায় বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন মতের ও পক্ষের মানুষদের হোমো সাকেরে পরিণত করার প্রক্রিয়া যতো শক্তিশালী হয়েছে, আওয়ামী লীগের একদলীয় সার্বভৌম শাসনও ততো পোক্ত হয়েছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে হেফাজতে ইসলাম ও ওলামা লীগের মতো ইসলামপন্থী সংগঠনগুলো। কাকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা যাবে এবং কাকে হত্যা করলে কোন বিচার হবে না সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা যারা রাখেন ইতিহাস ঘেটে আগামবেন তাদেরকেই সার্বভৌম (sovereign) দাবি করেছেন। প্রাচীন কালে এদেরকে রাজা, সম্রাট ইত্যাদি নামে ডাকা হতো।

র‍্যাব অথবা পুলিশের হাতে তথাকথিত ক্রসফায়ারে নিহত একজন সন্ত্রাসী 'হোমো সাকের' ছাড়া আর কি? তাকে তো বিচার ছাড়াই হত্যা করা যায়। এইক্ষেত্রে নিহত এবং খুনি দুইজনই জনগণের চোখে আইনের উর্ধ্বে।

আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে সার্বভৌম ঘোষণা করা হলেও বাস্তবতা এর চাইতে অনেক জটিল ও দুর্বোধ্য। যেখানে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করতে বাধ্য সেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সমর্থন কিংবা এই ধরনের হত্যাকারীকে বিচারের আওতায় বাইরে রাখা হলে তখন এই পরিস্থিতিকে বলা যায় 'স্টেট অফ এক্সেপশন'। এই স্টেট অফ এক্সেপশন যিনি ঘোষণা করতে পারেন তিনিই সার্বভৌম। বাংলাদেশে বর্তমানে আওয়ামী লীগ, তার সহযোগী অথবা লেনদেনের মাধ্যমে সহাবস্থানকারী ও ক্ষমতা বিস্তারকারী বিরোধী পক্ষগুলোই এই মুহূর্তে এই ধরনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার নামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে বর্তমানে যে একদলীয় শাসন কায়েম করেছে তাকে এই সরকারের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন নাম দিয়েছেন 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'। গণতন্ত্র আর একনায়কত্ব কিভাবে একসাথে চলে? এই তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'কে 'স্টেট অফ এক্সেপশন' ছাড়া আর কি বলা যায়? কাঠালের আমসত্ত্বও বলা যেতে পারে। তাতেও অর্থের খুব বেশি উনিশ বিশ হবে বলে মনে হয় না। স্টেট অফ এক্সেপশনের উদাহরণ টানতে আগামবেন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন হিটলারের নাজি বাহিনীর শাসনের কথা, জনগণের সাংবিধানিক অধিকার বাতিল করে দিয়ে এগারো বছরের 'স্টেট অফ এক্সেপশন' কায়েম করেছিল হিটলার। আগামবেনের ভাষায় -

"থার্ড রাইখের পুরো বারো বছরের শাসনকালকে এক ধরণের 'স্টেট অফ এক্সেপশন' গণ্য করা যেতে পারে। সেই হিসাবে, আধুনিক টোটালিটারিয়ানিজম হলো স্টেট অফ এক্সেপশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের আইনি গৃহযুদ্ধ, যার মাধ্যমে শুধু রাজনৈতিক শত্রুদেরই নয়, নাগরিকদের কোন একটি বিশেষ অংশকেই পুরোপুরি খতম করে দেয়ার রাস্তা তৈরি হয়, যদি নাগরিকদের ঐ অংশকে কোন কারণে রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে আত্মীকরণ করা না যায়"(আগামবেন, ২০০৫) ।

যদিও শাহবাগ আন্দোলন থেকে ফায়দা তুলে আওয়ামী লীগ তার এক দলীয় টোটালিটারিয়ান শাসন পোক্ত করেছে কিন্তু তাদের বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হলো সকল সেকুলার বিরোধী পক্ষকে রাজনৈতিকভাবে দমন করা, ইসলামিস্টদেরকে প্রধান বিরোধী পক্ষ হিসাবে হাজির করা এবং তাদের সাথে বড় ধরনের বিরোধে না জড়ানো। সর্বোপরি বাংলাদেশে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের জুজু টিকিয়ে রেখে 'ওয়ার অন টেররে'র স্থানীয় বরকন্দাজের ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক সমর্থন ধরে রাখা। এই পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আর যাই হোক নাস্তিক ব্লগারদার আত্মীকরণ বা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না। এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে নাস্তিকরা অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র বহির্ভূত হিসাবে। যাদেরকে হত্যা করা যায়, যাদের হত্যার বিচার হয় না এবং যাদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে সরকার নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করতে পছন্দ করে। কিন্তু বাংলাদেশে চলমান এই 'স্টেট অফ এক্সেপশনে'র শেষ কোথায়? তার আগে প্রশ্ন তুলতে হবে এর শুরু কোথায়? দুই বছরের সামরিক বাহিনী সমর্থিত 'জরুরি অবস্থা'র পর আওয়ামী লীগের উত্থানের সাথে সাথেই কি এই 'ব্যতিক্রম অবস্থা'র সৃষ্টি হয়েছে, না কি এর শুরু আওয়ামী লীগ সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করার পরে? না কি এর শুরু ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শাহবাগের ময়দানে? না কি ৫ জানুয়ারি

২০১৪ সালের নির্বাচন থেকে এর শুরু? এর শুরু কিন্তু একাত্তরেও হতে পারে। অথবা কোন সুদূর অতীতে। এই প্রশ্নের একটি যথাযথ উত্তর এই লেখায় সন্ধান করা সম্ভব হবে না। তবে প্রশ্নগুলোকে আরেকটু স্পষ্ট করা যেতে পারে।

আগামবেন দাবি করেছেন 'হোমো সাকের' এবং 'সোভেরিন' এই দুই ধারণার কাঠামো আসলে এক, বৈশিষ্টও একই রকম। ঐতিহাসিক হিসাবে এই দুই সত্তা একই দেহে বিরাজ করেছে। হোমো সাকের শব্দের অর্থ কি? অর্থ বোঝার জন্যে এটা জানা দরকার যে ইংরেজি সেক্রেড শব্দটির আদি উৎস রোমান 'সাকের' শব্দটি। সেক্রেড শব্দের মতোই সাকের শব্দের অর্থ 'পবিত্র'। হোমো সাকের এমন এক পবিত্র জীবন যাকে বিচার করে হত্যা করা যায় না, কিন্তু বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করলে তার কোন বিচার হয় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পৃথিবীতে সোভেরিনের বৈশিষ্টও অনেকটা এইরকমই। সোভেরিন সবসময়ই আইনের উর্ধ্বে, আবার তত্ত্বগতভাবে তিনি আইনের অধীনেও বটে। তিনি একই সাথে আইনের ভেতরে ও বাইরে অবস্থান করেন, ঠিক হোমো সাকেরের মতোই। প্রাচীন কালে রাজা বা সম্রাটকে বিচার করে হত্যা করা যেতো না, কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দে কেউ তাকে হত্যা করে তার স্থলাভিষিক্ত হলে কোন ধর্মীয় বা সেকুলার আইনে তার বিচার ছিল না। নতুন রাজাকে হত্যা করতে গেলেও অভ্যুত্থান অথবা যুদ্ধের মাধ্যমেই হত্যা করতে হতো। আধুনিক যুগেও রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে বড়জোর ইমপিচমেন্টের শিকার হতে হয়, যার একমাত্র শাস্তি দায়িত্ব থেকে অপসারণ। রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় তাকে বিচার করে হত্যা করা অসম্ভব। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ক্ষমতায় আসীন থাকা অবস্থায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। যারা তাকে খুন করেছিল খোন্দকার মোস্তাক সরকার খুনিদেরকে ইনডিমনিটি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এসে জিয়াউর রহমান সেই ইনডিমিনিটি অব্যাহত রেখেছিলেন যা দীর্ঘস্থায়ী ছিল প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময়। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এই ইনডিমনিটির পক্ষে সমর্থন ছিল। সমর্থকরা বিভিন্ন রকম যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যা ও তার বিচারহীনতা সোভেরিনিটি ও সেক্রেডনেসের আদি বৈশিষ্টগত জায়গা থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে বঙ্গবন্ধু জীবিত অবস্থায় সোভেরিন আর নিহত হওয়ার পর হোমো সাকেরের পরিচয় লাভ করেছিলেন, যাকে বিচার করে হত্যা করা যায় না, কিন্তু কেউ হত্যা করলে তার বিচার হয় না। প্রাচীন রোম সম্রাট অগাস্টাস সিজারের দেহে সেক্রেডনেস এবং সোভেরিনিটির এই রকম এক সাথে বিরাজ করার উদাহরণ দিয়েছেন আগামবেন খোদ অগাস্টাস সিজারের উক্তি ব্যবহার করে (আগামবেন, ১৯৯৮)।

সোভরিনিটির ধারণার আদি উৎস কি? আগামবেন দেখিয়েছেন, প্রাচীন গ্রিসের নগরগুলোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ধারণার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে পরিবারের কর্তা হিসাবে পিতা সোভেরিন ক্ষমতা সহকারে হাজির। পিতা তার স্ত্রী এবং সন্তানদের জীবন মরণের মালিক। প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে সোভেরিন রাজা জনগণের পিতায় পরিণত হলেন। সার্বভৌম রাজা সেই হিসাবে সার্বভৌম পিতার বিবর্তন মাত্র। আগামবেনের ভাষায়-

" *'জনতার পিতা' (father of the people) নামক যে হেজিওগ্রাফিক বিশেষণটি প্রতি যুগের সার্বভৌম নেতার একটি টাইটেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার মধ্যে এর উৎসগত অশুভ অর্থটিই প্রকাশিত হয়*" (আগামবেন, ১৯৯৮)।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 'জাতির পিতা' টাইটেল লাভ ও গ্রহণ করেছিলেন। সাংবিধানিকভাবে জনগণের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা থাকলেও আধুনিক বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু প্রাচীন পৃথিবীর রাজা, সম্রাট ও পরিবারের সার্বভৌম কর্তার পরিচয় ও অধিকার লাভ করেছিলেন, যার প্রমাণ তাঁর 'জাতির পিতা' টাইটেল। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও জাতির পিতা টাইটেলটি তার উৎসগত অশুভ অর্থসহই ঐতিহাসিকভাবে হাজির হয়েছিল। সার্বভৌম পিতা হিসাবে বাঙলার জনগণের জীবন ও মরণের ক্ষমতা এই টাইটেলের মাধ্যমে তিনি লাভ ও গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর যারা তার হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দিয়েছেন তারাও ঘটনাচক্রে সোভেরিনিটি ও সেক্রেডনেসের সেই আদি ধারণার প্রতিই বিশ্বস্ত ছিলেন, যেই ধারণা মোতাবেক সেক্রেড ও সোভেরিন মানুষকে যে কেউ হত্যা করতে পারে এবং এই হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয় না।

জর্জিও আগামবেন ফরাসী বিপ্লবের সময় রাজা লুই-এর মৃত্যুদণ্ডের উদাহরণ টেনেছেন। মাইকেল ওয়ালজারের বরাত দিয়ে আগামবেন উল্লেখ করেছেন যে রাজা লুই-এর যখন মৃত্যুদণ্ডের সময় 'একজন রাজা খুন হচ্ছে' এটা জনগণের চোখে কোন নতুন ঘটনা ছিল না। নতুন ঘটনা ছিল বিচারের মাধ্যমে একজন রাজাকে খুন করা। ঘটনাচক্রে সেই সময় জেকোবিনরা দাবি তুলেছিল রাজা লুই'কে বিচার ছাড়াই হত্যা করতে হবে। আগামবেনের ভাষায়-

সার্বভৌম পিতা হিসাবে বাঙলার জনগণের জীবন ও মরণের ক্ষমতা এই টাইটেলের মাধ্যমে তিনি লাভ ও গ্রহণ করেছিলেন।

"*১৭৯২ সালের কনভেনশনের আলোচনা চলাকালীন সময়ে জেকোবিনরা যখন রাজাকে বিচার ছাড়াই হত্যা করার প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তারা মূলত পবিত্র জীবনের (sacred life) বিচারিক হত্যাকাণ্ডের অসম্ভাব্যতার বৈশিষ্টই হাজির করেছিল। তারা ঠিক সেই রহস্যময় ধারণার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল (যদিও খুব সম্ভবত তারা তা অনুধাবন করতে পারেনি) যা অনুসারে পবিত্র জীবনকে যে কেউ হত্যা করতে পারে এবং তা অপরাধ বিবেচিত হবে না, কিন্তু এই পবিত্র জীবনকে বিচারিক বা অনুমোদিত হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।*" (আগামবেন, ১৯৯৮)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচার করেই রাজা লুই-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা মধ্যযুগীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা থেকে আধুনিক সার্বভৌমত্বের ধারণায় উত্তরণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে একটি আধুনিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও তার পরবর্তী ইতিহাসে আধুনিক নয়, প্রাচীন সার্বভৌমত্বের ধারণার প্রাবল্য দেখা যায়। এই ইতিহাস জাতির জনক শেখ মুজিব কিংবা শহীদ জিয়ার মতো সেক্রেড ও সোভেরিনদের ইতিহাস। কার হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে এবং কার হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না সেই সিদ্ধান্তের মালিক হিসাবে হাজির এই সেক্রেড সোভেরিনরা। যদিও বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে এবং সাংবিধানিকভাবে তাদেরকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম মালিক ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু একাত্তরে এই জনগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে দেখা গেলো যে তার বিচার পাওয়ার এখতিয়ার জনগণের হতে থাকলো না। তা বাধাগ্রস্ত হলো ভারত পাকিস্তানের কূটনীতি, মধ্যপ্রাচ্যের খবরদারি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমায়। একাত্তরে যারা খুন হয়েছেন তারা 'শহীদ' নাম ধরে হোমো

সাকেরে পরিণত হলেন, যাদেরকে বিচার করে হত্যা করা হয় নাই এবং যাদের হত্যাকাণ্ডের কোন বিচারও নাই। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তারাও দীর্ঘ সময় এই বিচারের প্রসঙ্গ দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

সার্বভৌম সিদ্ধান্তের অধিকারী বিচারপতির বিচার মেনে না নিয়ে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি তুলে শাহবাগ আন্দোলনের যখন সূত্রপাত হয়েছিল, তখন আন্দোলনকারীরা নিজেরাই সার্বভৌম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু খোদ বিচার ব্যবস্থা ও আওয়ামী লীগ সরকারের সার্বভৌমত্বকেও তারা মেনে নিয়েছিল। নিজেদের সার্বভৌমত্বের এই প্যারাডক্স থেকে শাহবাগের আন্দোলনকারীরা কখনোই মুক্ত হতে পারে নাই। কিন্তু শাহবাগের আন্দোলনকারীরা জ্যাকোবিনদের মতো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের দাবিদার ছিল না। তারা বিচার করেই যুদ্ধাপরাধীদের হত্যার দাবি তুলেছিল, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইমপিউনিটির এমন একটা স্তরের মানুষ ছিলেন যাদেরকে মোটামুটি মধ্যযুগীয় সার্বভৌম বলা যায়, যাদের কে বিচার করে হত্যা করা যায় না। কামারুজ্জামানের পুত্র যে একবার সামহোয়ারইন ব্লগে 'পারলে বিচার কইরা ফাঁসি দাও' বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন, তা কি নেহায়েত ঘটনাচক্রে তুলেছিলেন না কি তা তার পিতার সার্বভৌমত্বের পক্ষে একটি ঘোষণা ছিল? যা এমন এক সার্বভৌম ক্ষমতা যার বলে তাকে বিচার করে হত্যা করা সম্ভব নয়।

শাহবাগ আন্দোলনের সময় কেউ কেউ দাবি তুলেছিলেন যে আন্দোলনকারীরা পাবলিক লিঞ্চিং এর আয়োজন করেছে। এই বক্তব্য মোটা দাগে সত্য নয়। পাবলিক লিঞ্চিং হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের সময়। তখন রাজা লুই-কে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলেও অনেক অভিজাত ফরাসি নাগরিক পাবলিক লিঞ্চিংএর শিকার হয়ে নির্বিচারে নিহত হয়ে হোমো সাকেরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। শাহবাগ আন্দোলনকারীরা যে যুদ্ধাপরাধীদের নির্বিচার হত্যার দাবি তোলে নাই, বরং বিচার করে হত্যার দাবি তুলেছিল, এটাও নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি আধুনিক ঘটনা। সেই হিসাবে শাহবাগের আন্দোলনকারী ও তার সমর্থকরা কোন মধ্যযুগীয় পাবলিক লিঞ্চিংএর আয়োজন করে নাই। কিন্তু দেশজুড়ে সেই সময়ে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ও সমর্থকদের একটা বড় অংশই নিশ্চুপ ছিল, কেউ কেউ এমনকি নৈতিক সমর্থনও জানিয়েছে। ভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতাদর্শের মানুষদের গড়পরতা 'সন্ত্রাসী' বিবেচনা করে (ও আইনের উর্ধ্বে) তাদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড মেনে নেয়ার মানে হচ্ছে ঐ মানুষদেরকে 'হোমো সাকের' হিসাবে গণ্য করা। আগামবেন ৯/১১ পরবর্তি সময়ে বুশ প্রশাসনের ভূমিকার কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় -

"রাষ্ট্রপতি বুশের শাসনের নতুনত্ব হচ্ছে যে, তা রীতিমত বিপ্লবাত্মক কায়দায় একজন ব্যক্তিকে সকল আইনী অধিকার বঞ্চিত করে তাকে আইনগতভাবে বেনামী ও শ্রেণীবিভাগের অনুপযুক্ত সত্ত্বায় পরিণত করে। আফগানিস্তানে আটক হওয়া তালিবানরা না পায় জেনেভা কনভেনশন অনুসারে প্রাপ্য আন্তর্জাতিক যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা, না পায় মার্কিন আইনে অভিযুক্ত একজন অপরাধীর অধিকার।"
(আগামবেন, ২০০৫)

তবে আগামবেন হোমো সাকেরের ধারণাটিকে যে দার্শনিক জায়গা থেকে বিবেচনা করেন, স্লোভেনিয়ান বামপন্থী দার্শনিক স্লাভো জিজেক এর মতে, সেই এনালিসিস আসলে বহির্ভূত কে অন্তর্ভুক্ত করার কোন রাজনীতির কথা বলে না, তা শুধু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে আমরা সবাই আসলে হোমো সাকের (homo sacer is the 'truth' of all of us) (জিজেক, ২০১০)। আমরা জিজেকের সাথে একমত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে বহির্ভূতকে কে অন্তর্ভুক্ত করার রাজনীতিটা কেমন হবে? বেয়ার লাইফ বা জীবের জীবন থেকে বাংলাদেশের ব্লগাররা নাগরিকের জীবন কিভাবে ফেরত পাবে? বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি মোকাবেলা করার উপায় কী? বাংলাদেশে এখন যে স্টেট অফ এক্সেপশন জারি আছে তার সূচনা কোথায় ও কখন ঘটেছে? এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী? স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সীমা পরিসীমা নির্ধারণ যে আমাদের জীবন দিয়ে করতে হচ্ছে, এই রক্তস্নাত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার শেষ কোথায়? তা থেকে কেমন বাংলাদেশে আমরা উপনীত হবো? বাংলাদেশ সংক্রান্ত এইসব প্রশ্ন সারা বিশ্বজুড়ে চলমান কিছু সাম্প্রতিক প্রশ্নের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সম্ভব না। বাংলাদেশে সেকুলার ডেমোক্রেসির যে সংকট, সেই সংকট তো এখন সারা দুনিয়ারই সংকট। আর এই সংকটের গোড়ায় আছে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ।

> শাহবাগের আন্দোলনকারীরা জ্যাকোবিনদের মতো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের দাবিদার ছিল না। তারা বিচার করেই যুদ্ধাপরাধীদের হত্যার দাবি তুলেছিল।

আমরা যারা আজকের বাংলাদেশে ও বিশ্বজুড়ে চলমান স্টেট অফ এক্সেপশনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত আছি বহির্ভূত হিসাবে, আমাদের যাদের মধ্যে হোমো সাকের হাজির আছে অমোঘ সত্য হিসাবে, আমাদের রাজনৈতিক (সাম্প্রদায়িক নয়) যুথবদ্ধতাই হয়তো এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়। আগেই বলেছি, এই লেখার উদ্দেশ্য প্রশ্নের উত্তর দেয়া নয়, প্রশ্নগুলোকে পরিস্কার করে হাজির করা। সেটাও কতোটুকু করতে পেরেছি জানি না। বিচারের দায় পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম।

পারভেজ আলম: লেখক ও ব্লগার
ইমেইল: stparvez@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[আহমেদ, ২০১৫] বখতিয়ার আহমেদ, গুম-খুন-আতঙ্ক : শাসনপ্রণালী ও হত্যার কথকতা, বাধন অধিকারী সম্পাদিত "বাংলাদেশ পরিস্থিতি: নয়া উদারবাদী যুগে শাসনপ্রণালী ও কথকতা" সংকলণের অন্তর্ভূক্ত, মঙ্গলধ্বনি, ঢাকা।

[আগামবেন, ১৯৯৮] Agamben, Giorgio (1998), Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press-Stanford, California.

[আগামবেন, ২০০৫] Agamben, Giorgio (2005), State of Exception, University of Chicago Press, Chicago.

[জিজেক,২০১০] Zizek, Slavoj (2010), Living in the End times, Verso, London.